কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ কে এম শাহনাওয়াজ

গিনিপিগ শিক্ষার্থীদের আর্তনাদ

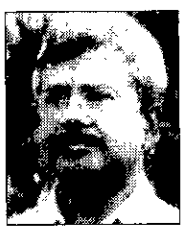

আমাদের নানা নিরীক্ষায় গিনিপিগ হয়ে যাওয়া ওজনদার সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া শিক্ষার্থীদের জগৎ অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ সময়ের শিক্ষার্থীদের বড়সংখ্যক বৃত্ত ভরাট, নানা বইয়ের বিশাল ভার বহন, সৃজনশীল জাতীয় বিষয় সামাল দিতে কোচিং সেন্টার আর গাইডের ভেতর আটকে গিয়ে মেধাচর্চার সময় আর বের করতে পারেনি। এই যন্ত্রযুগের শিক্ষার্থীর মেধা অনেক বেশি চকচকে। কিন্তু স্কুল ও কলেজে গিনিপিগ বানিয়ে ওদের প্রতিবন্ধী-বামন করে রাখা হয়েছিল

আমাদের দেশে এত ঘটনার ঘনঘটা হয় যে একটির রেশ না কাটতেই সেটি তামাদি হয়ে নতুন আরেকটি ঘটনা এসে তা চলমান হয়ে যায়। এসবকে ঘটনা না বলে অঘটন বলাই ভালো। আর সে কারণে কোন অঘটনের শেষ পরিণতি কী তা দৃশ্যপটে থাকে না। কদিন আগে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে কজন জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর ইন্টারভিউ নিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষার মানের অধোগতির কথা তুলে ধরা হলো। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কম হইচই হয়নি। কেউ ধিক্কার দিয়েছেন চ্যানেলটিকে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করায়। বলতে চেয়েছেন এসব ছাত্রছাত্রীকে অপদস্থ করা হয়েছে সবার সামনে। তাদের পরিবারকেও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কারো পরামর্শ ছিল, শিক্ষার্থীদের মুখ ঢেকে প্রচার করা যেত। আবার কেউ রিপোর্টে বাস্তব সত্য প্রকাশ করায় বাহবা দিয়েছেন। কারো অভিমত ছিল, এই রিপোর্টের শিক্ষার্থী কজন বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই সাধারণীকরণ করার কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

রিপোর্ট প্রকাশ করায় তা ন্যায়ানুগ হয়েছে কি না আমি জানি না। তবে শিক্ষক হিসেবে আমার অনুসন্ধান আর অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, শিক্ষার মান সত্যি অনেক নেমে গেছে। আর এই নামার পেছনে ক্রমাগতভাবে যাঁরা নিরীক্ষা করে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন আর গিনিপিগ বানাচ্ছেন শিক্ষার্থীদের, তাঁদের আমি অনেক বেশি দায়ী করতে চাই। সারা দুনিয়ায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষা হচ্ছে, তাই আমাদেরও সে পথে আসতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার তেমন বক্তব্য নেই। কিন্তু ফল লাভের জন্য ভাবনা ও লেখার জগৎ বন্ধ করে দিয়ে বৃত্ত ভরাটের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মেধাচর্চার পথটি রুদ্ধ করে দেওয়া হলো। সবাই ছুটতে লাগল জিপিএ ৫ পাওয়ার জন্য। কারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানেন, ফলাফলের এই তাবিজ ছাড়া ভালো কলেজে ভর্তি মিলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বৃত্ত ভরাটের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অবারিত হলো কোচিং ব্যবসায়ীদের দ্বার। কোচিংয়ে ভর্তির জন্য হুমড়ি খেতে লাগলেন অভিভাবকরা। বৃত্ত ভরাটের খেলায় পাকা হওয়ার জন্য মডেল টেস্ট নামে আরেক বাণিজ্যও পাকা হলো। কিন্তু কারিকুলাম স্বাভাবিকতা হারানোয় জিপিএ ৫ পাওয়ার সুযোগ বেড়ে গেলেও মুক্ত হাতে লেখা ও চিন্তনের জায়গাটি সংকুচিত হতে লাগল।

টিভি চ্যানেলের রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় কেউ যদি ভাবেন এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তবে আমি বলব বিষয়টি উল্টো। শিক্ষার্থীদের আমি দোষারোপ করব না। ওরা স্বাভাবিক মেধা নিয়েই বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা গিনিপিগ বানিয়ে তাদের ঘাড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পদ্ধতি চাপিয়ে দিচ্ছি। ফলে মেধা বিকাশের স্বাভাবিক প্রবণতা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার মান অবনমনের পেছনে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার অনেকটা ভূমিকা রেখেছে। কে যে আমাদের ক্ষমতাসীন রাজনীতির বিধায়কদের কানে মন্ত্রণা দিয়েছে পাসের হার আকাশচুম্বী হলে আর জিপিএ ৫-এর হাইব্রিড ফলন হলে সবাই হাততালি দেবে যে এই সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা সফল; যদিও সরকারপক্ষ বারবার অস্বীকার করে আসছে, কিন্তু স্কুল-কলেজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকরা জানেন কিভাবে তাঁদের বাধ্য করা হয় হাতভরে নম্বর দিতে। এতে মাঝারি মানের শিক্ষার্থীরা জানে এখন পরীক্ষায় ভালো ফল করতে খুব একটা জানার প্রয়োজন নেই। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ফল করার প্রতিযোগিতা কমে গেছে। কারণ তারা জানে, এভাবেই তারা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

ছাত্রছাত্রীদের ভেতরকার মৌলিকত্ব জাগিয়ে তুলে তাকে চিন্তাশীল অনুসন্ধানী করার ইচ্ছা থেকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সৃজনশীল পদ্ধতি এখন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আর গাইড ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শুভেচ্ছা বার্তা বয়ে এনেছে। একটি লাগসই ভালো পদ্ধতি বলে বিদেশ থেকে এই সৃজনশীল ধারণা আনা হয়েছে। ২০১১ সালে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এনসিটিবির সিলেবাস ও পুস্তক প্রণয়ন কমিটিতে আমি সদস্য হিসেবে ছিলাম। এখানেই আমি প্রথম সৃজনশীল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানি। আমার বিবেচনা অনুযায়ী আমি বলেছিলাম, দেশজুড়ে প্রতিটি স্কুলের নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন ঠিক হবে না। তখন বলা হয়েছিল, এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে জেলায় কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই শিক্ষকরা আবার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের তিন-চার দিনের ট্রেনিং দিতেন। আমি অনেক অঞ্চলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এই স্বল্প প্রশিক্ষণে তাঁদের অনেকেই পুরো বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারেননি। আর উল্লেখযোগ্য স্কুলের শিক্ষকরা আদৌ প্রশিক্ষণ পাননি। দেশজুড়ে এই সংকটে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা যখন খাবি খাচ্ছিলেন, তখন ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন গাইড ব্যবসায়ীরা। যে গাইড নোট বন্ধের একটি উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির চিন্তা করা হয় তা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়ে অসময়ে চালু করে ফেলায় কোচিং আর নোট-গাইডের দরজাটিই খুলে দেওয়া হলো। একটি ভালো পদ্ধতি যথাযথভাবে যথাযথ সময়ে প্রয়োগ না করার কুফল এখন আমাদের শিক্ষার্থীরা ভোগ করছে।

সৃজনশীল পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জাফর ইকবাল গত সপ্তাহে কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় চমৎকারভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি কী তা বুঝিয়েছেন। এভাবে যদি ২০১১ সালে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বোঝানো যেত, তাহলে হয়তো এই পদ্ধতির বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হতো। এখন মনে হচ্ছে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষার্থীদের সব মেধাবী চিন্তার প্রায়োগিক পরীক্ষার জন্য বরাবরই আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা গিনিপিগই রয়ে গেল। ওদের আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। আমার তিন দশকের বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম নিয়ে এনসিটিবির সঙ্গে বিগত প্রায় দেড় দশক বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে আমি কেন যেন বড় বড় মানুষের সব চিন্তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। সুযোগ পেলে আমার মতামত উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের দুর্বল কণ্ঠ সবল কণ্ঠে চাপা পড়ে গেছে বারবার। ২০১১ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রয়োগের যে বাস্তব সংকট নিয়ে অস্বস্তি-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম ২০১৬ সালে এসেও তা থেকে বেরোতে পারলাম না। শিক্ষক, শিক্ষার্থী আর অভিভাবকরাও বেরোতে পারলেন না।

আমি বিশ্বাস করি, যেকোনো কাঠামোবদ্ধতার ভেতর আটকে ফেলার মধ্যেই রয়েছে শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব। শিক্ষার্থীকে মেধাচর্চা ও মেধা বিকাশের জন্য আমরা যেন আবারও একটি ছকের মধ্যেই বন্দি করে ফেললাম। এই ছক শিক্ষকের কাছে স্পষ্ট না হলেও গাইড ব্যবসায়ী আর প্রণেতাদের কাছে স্পষ্ট হলো। তাঁরা সুযোগটি গ্রহণ করলেন। প্রবলভাবে গাইডের জগতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের টেনে আনলেন। আমি যতটুকু খোঁজ নিয়ে জেনেছি, উল্লেখযোগ্য স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে গাইডে থাকা প্রশ্নই জুড়ে দেওয়া হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী বর্তমান বাস্তবতায় কতটা মেধাচর্চার সুযোগ পাচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়।

আমি জানি না, সনাতন পদ্ধতিকে কেন মুখস্থবিদ্যানির্ভর বলে অচ্ছুৎ ভাবা হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জাফর ইকবাল থেকে শুরু করে এ দেশের অসংখ্য গুণী মানুষ—এমনকি আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষও এই পদ্ধতিতেই পড়ে এসেছি। সবাই যে মুখস্থবিদ্যানির্ভর হয়ে পড়েছিলাম তেমন নয়। মানতেই হবে, প্রশ্নের উত্তর তথাকথিত মুখস্থের মধ্য দিয়ে তৈরি করতে গিয়ে কিছু জানাও হয়ে যেত। জনাব জাফর ইকবাল যথার্থই বলেছেন, এ সময়ের সৃজনশীল নতুন কিছু নয়। অনেক শিক্ষক মেধাচর্চার সুযোগ থাকলেও অমন প্রশ্ন এমনিতেই তৈরি করে থাকেন। তাহলে এখন আরোপিত সৃজনশীল কি একটি ছকবন্দি কাঠামোমাত্র? এই বন্দিত্ব নিয়েই আমার আশঙ্কা।

উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজি গদ্যে আমাদের একটি প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল 'রিডিং ফর দ্য প্লেজার'। আসলেই মেধাচর্চার জন্য পড়াটা হওয়া উচিত আনন্দের। প্রীতিকর—ভীতিকর নয়। আমরা কি সনাতন ধারাকে রূপান্তর না করে আধুনিক করতে পারতাম না? কোনো বিদেশি পণ্ডিত তাঁদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কী ছক আঁকলেন, তা-ই আমাদের প্রয়োগ করতে হবে কেন? শিক্ষকদের প্রথাগত প্রশিক্ষণ নয়, এই পরামর্শটি পল্লবিত করে দেওয়াই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি যে প্রশ্নপত্রে গতানুগতিকতা থাকবে না। ছোট প্রশ্ন, মাঝারি প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন নানাভাবে ভাগ করে নিতে পারি। শিক্ষার্থী গাইড বা কোচিংনির্ভর না হয়েও মূল বই পড়ার ভেতর থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে পারে. একজন শিক্ষক সেভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন। প্রতিবছর প্রশ্নের মোড় ঘুরে যাবে। ফলে কয়েকটি নির্ধারিত প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসবে অমন ধারণা আর কার্যকর থাকবে না। পাঠ্য বইয়ে কোনো দেশের জনসংখ্যা থাকলেও অজানা জায়গা থেকে নারীর সংখ্যা কত বলে কচি বয়সে পরীক্ষার হলে বসে অত ভাবনায় ফেলে দেওয়ার পক্ষে আমি নই। ধারণা করে অর্ধেক বলে দেওয়ার মতো দুর্বল বিজ্ঞানে অভ্যস্ত করতেও আমি রাজি নই। গাইডের বা কোচিং সেন্টারের নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর নয়—আমি মনে করি, প্রতিবার ভাষা পরিবর্তন বা প্রশ্নে চাওয়াটাকে পরিবর্তন করে প্রশ্ন করতে পারলে এবং সব উত্তর পাঠ্য বইতে থাকলেই বয়স অনুযায়ী শিক্ষার্থীর যতটুকু চিন্তনশক্তির চর্চা করা সম্ভব তা করে অভীষ্টে পৌঁছা কঠিন নয়। এটুকু মেধাচর্চায় অভ্যস্ত করতে পারলে স্কুলের শিক্ষার্থী কলেজে এসে নিজেকে আরো মেলে ধরতে পারবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর আমরা শিক্ষকরা যদি ক্লাসের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকি, ছকবন্দি প্রশ্নের ধারা থেকে নিজেদের অবমুক্ত রাখতে পারি, তাহলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ কঠিন নয়। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কারিকুলাম আর পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানী বানিয়ে ফেলে না। প্রত্যেকের মেধা বিকাশের একটি পথ করে দেওয়ামাত্র। আর সেই পথে হেঁটে যে যার যোগ্যতামতো প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায়।

আমরা যারা দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি তাঁরা সহজেই তুলনা করতে পারি, আগের সনাতন ধারায় পড়ে এসে ওদের স্বাভাবিক পুঁথিগত জানার জগৎ যতটা বিস্তৃত ছিল আর আমাদের নানা নিরীক্ষায় গিনিপিগ হয়ে যাওয়া ওজনদার সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া শিক্ষার্থীদের জগৎ অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কারণ এ সময়ের শিক্ষার্থীদের বড়সংখ্যক বৃত্ত ভরাট, নানা বইয়ের বিশাল ভার বহন, সৃজনশীল জাতীয় বিষয় সামাল দিতে কোচিং সেন্টার আর গাইডের ভেতর আটকে গিয়ে মেধাচর্চার সময় আর বের করতে পারেনি। আমি তো মনে করি এই যন্ত্রযুগের শিক্ষার্থীর মেধা অনেক বেশি চকচকে। টের পাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ পেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা অনেক শাণিত। কিন্তু স্কুল ও কলেজে গিনিপিগ বানিয়ে ওদের প্রতিবন্ধী-বামন করে রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে ওদের যে ক্ষতি আমরা করে ফেলেছি তার দায় জীবনের নানা সময়ে বহন করতে হচ্ছে।

এসব কারণে আমার বারবার মনে হয়, আমরা কি কোনো অচলায়তনে আটকে পড়েছি? গালভরা নিয়ম-পদ্ধতি নয়, শিক্ষাকে ও শিক্ষার্থীর চিন্তার জায়গাটিকে স্বাধীন করে দিতে না পারলে বোধ হয় আমাদের পরীক্ষাগার থেকে বারবার ব্যর্থতার ফলাফলই বেরিয়ে আসবে।

লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
shahnawaz7b@gmail.com